দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 03 AUG 2015 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ছাত্র রাজনীতি ▫ মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম

ছাত্র সংগঠনের সম্মেলন প্রসঙ্গে

বাংলাদেশ ছাত্রলীগের ২ দিনের দ্বি-বার্ষিক জাতীয় সম্মেলন হয়ে গেল। নির্ধারিত ২ বছরের পরিবর্তে ৪ বছরের মাথায় এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো। নানা কারণে ছাত্রলীগের এ সম্মেলন হয়ে উঠেছিল 'টক অফ দি নেশন'। সম্মেলনের প্রথম দিনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটির স্থান ছিল ঢাকার ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যান। সকলের মনোযোগ কেন্দ্রীভূত ছিল, ছাত্রলীগের অভিভাবক বলে স্বীকৃত শেখ হাসিনার আগমনের ও সম্মেলনের প্রধান অতিথি হিসেবে তার বক্তৃতার প্রতি। সম্মেলনের মঞ্চ থেকে সেদিন তিনি একটি উদ্দীপনাময় ও উপদেশমূলক বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তার বক্তৃতায় তিনি অনেক কথা বলেছেন। আবার কিছু প্রসঙ্গ নিয়ে কথা বলা থেকে তিনি বিরতও থেকেছেন। শেখ হাসিনা ছাত্রলীগের কর্মীদের লেখাপড়ায় মনোযোগী হতে, দুর্নাম হয় এমন কোনো কাজ থেকে বিরত থাকতে, অপরাধ-দুরাচার থেকে মুক্ত থাকতে পরামর্শ দিয়েছেন। এসব নিঃসন্দেহে খুবই প্রয়োজনীয় নির্দেশনামা। কিন্তু প্রশ্ন হলো এসব নির্দেশ প্রদানের দ্বারা কোনো কাজ হবে কি? সম্মেলন শেষ হওয়ার পর পরই বিভিন্ন জায়গায় যেসব ঘটনা ঘটছে, তাতে তো মনে হচ্ছে না যে এতে কোনো কাজ হবে।

প্রচার মাধ্যমের কল্যাণে এসব বিষয় জানতে পেরে মনে পড়ে গেল ৪৩ বছরের আগের অমৃতসম কিছু স্মৃতি-কথা। একাত্তরের ডিসেম্বরে দেশকে হানাদার মুক্ত করার ৪ মাস যেতে না যেতেই ১৯৭২-এর এপ্রিলে এই সোহরাওয়ার্দী উদ্যানেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের ত্রয়োদশ সম্মেলন। আমি তখন সংগঠনটির সাধারণ সম্পাদক। সেই সম্মেলনে আমি সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলাম। এর মাস তিনেক পরেই স্বাধীন বাংলাদেশে ডাকসুর প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেই নির্বাচনে ছাত্র ইউনিয়নের প্যানেলসহ আমি ডাকসুর ভিপি পদে নির্বাচিত হয়েছিলাম। পরের বছর এই সোহরাওয়ার্দী উদ্যানেই আমার সভাপতিত্বে আরো বড় করে অনুষ্ঠিত হয়েছিল ছাত্র ইউনিয়নের চতুর্দশ সম্মেলন। ছাত্র ইউনিয়নের এই দুটি সম্মেলনেরই উদ্বোধক ও প্রধান অতিথি ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

সে সময় এখনকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানটি ছিল রেসকোর্স ময়দান নামে পরিচিত। ময়দানটি তখন ছিল বৃক্ষশূন্য। সেই ঐতিহাসিক ও বিশাল ময়দানে ছাত্র ইউনিয়নের সম্মেলন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত ছিল একটি দুঃসাহসিক পদক্ষেপ। কোনো ছাত্র সংগঠনই এর আগে এতো বড় জায়গায় সম্মেলন করার সাহস পায়নি। বিভিন্ন সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতো ঢাকা বার লাইব্রেরি হলে, স্বামীবাগ কমিউনিটি সেন্টার, মাহবুব আলী ইন্সটিটিউট, ইস্কেন্দার মির্জা হল (এখন যেটার নাম ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সটিটিউশন হল) ইত্যাদি স্থানে। কেবল ১৯৭০ সালে ছাত্র ইউনিয়নের দ্বাদশ সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল মহসিন হল সংলগ্ন খেলার মাঠে প্যান্ডেল টাঙ্গিয়ে।

মনে আছে, সেসময় সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের ছাত্র ইউনিয়নের সম্মেলনের স্থান হয়ে উঠেছিল এক প্রাণবন্ত উৎসবের প্রান্তর। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছিল সুসজ্জিত বেদি। সেখানে কুচকাওয়াজ করেছিল যুদ্ধের ময়দান থেকে সদ্য ফিরে আসা মুক্তিযোদ্ধাদের একটি চৌকস দল। এর পাশেই ছিল মঞ্চসহ সম্মেলন-অধিবেশনের বিশাল প্যান্ডেল। কিছুটা দূরে ছিল প্রদর্শনীর প্যান্ডেল। আরেক প্রান্তে ছিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্য পৃথক মঞ্চ। গোটা ময়দান জুড়ে নানা বিপ্লবী আবহসহ সম্মেলনের মূল বার্তা ছিল প্রবলভাবে দৃষ্টিগোচর।

১৯৭২ সালের ছাত্র ইউনিয়নের ত্রয়োদশ সম্মেলনের প্রবেশপথে বঙ্গবন্ধু, মওলানা ভাসানী, মোজাফ্ফর আহম্মেদ ও মণিসিংহ—এই চারজন জাতীয় নেতার বিশাল পোর্ট্রেট টাঙানো হয়েছিল। তাঁরা সকলেই আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। মওলানা ভাসানী ছাড়া অন্যরা সবাই এসেছিলেন এবং ভাষণ দিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধুর ভাষণে ছিল ছাত্র ইউনিয়নের নেতা-কর্মীদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা। তাদের কাছ থেকে শিক্ষা নেয়ার জন্য তিনি অন্যদেরকে পরামর্শ দিয়েছিলেন। সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যের কথা তিনি জোরালোভাবে তুলে ধরে ছাত্র ইউনিয়নকে সমাজতন্ত্রের কারিগর তৈরির কারখানা বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। অন্য নেতারাও তাদের বক্তৃতায় অনেক গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছিলেন।

ছাত্র ইউনিয়নের ত্রয়োদশ সম্মেলনের একটি প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল স্বাধীন দেশের শিক্ষানীতি। দেশ হানাদার মুক্ত হওয়ার তিন মাসের মধ্যে ছাত্র ইউনিয়ন একটি কমিশন গঠন করে 'খসড়া শিক্ষানীতির প্রস্তাবনা' প্রস্তুত করেছিল। সেটিই হয়ে উঠেছিল তিনদিন ধরে চলা উন্মুক্ত কাউন্সিল অধিবেশনের একটি প্রধান আলোচ্য বিষয়। এছাড়াও গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করা হয়েছিল সমাজতন্ত্রের পথে এগিয়ে যাওয়ার কাজে ছাত্র সমাজের ভূমিকা ও কর্তব্য প্রসঙ্গ, দেশ গড়ার সংগ্রামের কলাকৌশল ও সেক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট করণীয় প্রসঙ্গ, সাম্রাজ্যবাদের ষড়যন্ত্র মোকাবেলা করে দেশকে জাতীয়-মুক্তির ধারায় অগ্রসর করার ক্ষেত্রে কর্তব্যসমূহ ইত্যাদি বিষয়।

পুরানো সেসব দিনের কথা মনে জেগে ওঠার সাথে সাথে প্রশ্ন জাগছে—সেসব কথা বলার মানুষ আজ আছে কই? ছাত্রলীগের সম্মেলনে অনেক কথা বলা হয়েছে। অনেক ভাল ভাল কথাও। কিন্তু সমাজতন্ত্রের কথাটিতো একবারও উচ্চারণ করা হলো না! অথচ বঙ্গবন্ধু কেন? সমাজতন্ত্র বাদ দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারার কথা বলাটি কি 'Hamlet without the Prince of Denmark'-এর মতো ব্যাপার হয়ে উঠে না? সমাজতন্ত্রের কথা না হয় দূরেই রাখলাম। কিন্তু 'ধর্মনিরপেক্ষতা' সম্পর্কেও কি সম্মেলনে জোরালো বক্তব্য, ব্যাখ্যা ও করণীয় চিহ্নিত করা হয়েছে? না, তা করা হয়নি! একই কথা 'গণতন্ত্র' ও 'জাতীয়তাবাদ' সম্পর্কেও বলা যায়। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে জাতি যে চার রাষ্ট্রীয় মূলনীতি গ্রহণ করেছিল তার ব্যাখ্যা কি নতুন প্রজন্মের ছাত্র-ছাত্রীদের জানা হয়ে গেছে? মোটেও তা নয়! বরঞ্চ এসব বিষয়ে শিক্ষা-চেতনা কমতে কমতে এখন একেবারে তলানিতে এসে ঠেকেছে। এমতাবস্থায় রাষ্ট্রীয় চার নীতির মর্মার্থ যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করার কাজের গুরুত্ব মোটেও কমেনি, বরঞ্চ তা আরো বেড়েছে।

ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের পাশে নিয়ে আমি নিজে অনেক সংগ্রামে সামিল থেকেছি। পরস্পরের ভালো-মন্দ নিয়ে অনেক কথাবার্তা তাদের সাথে হয়েছে। ছাত্রলীগের 'প্রকৃত' কল্যাণ সর্বসময়ই আমার কাম্য ছিল ও আজো আছে। এক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার যে, শুধু স্তুতিবাক্য দ্বারা 'প্রকৃত' কল্যাণকরের পরিচয় প্রমাণিত হয় না। অধ্যাপক রহমান সোবহানের 'আমার সমালোচকরাই হলো আমার প্রকৃত বন্ধু'—এই কথাকে আমি সঠিক বলে মনে করি। '৭২ ও '৭৩-এর ছাত্র ইউনিয়নের সম্মেলনে দেয়া ভাষণে বঙ্গবন্ধু আমাকে আমার চোখে ধরা পড়া যেকোনো ত্রুটি-দুর্বলতা তার কাছে প্রকাশ করার অনুরোধ করেছিলেন। সেই নৈতিক বিবেচনা ও অধিকার বলে দু'একটি কথার অবতারণা করবো। এর সবটাই বন্ধুসুলভ শুভকামনা প্রসূত।

'বাংলাদেশের ইতিহাস হলো ছাত্রলীগের ইতিহাস', কিম্বা 'ছাত্রলীগ হলো বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সংগঠন' ইত্যাদি কথাবার্তা শুধু অতিরঞ্জনই নয় তা অসত্য বাগাড়ম্বরও বটে। প্রকৃত সত্য হলো, পাকিস্তানের জমানায় ... হয়েছিল ছাত্র ইউনিয়ন। বস্তুত বাংলাদেশের ইতিহাস হলো বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও বামপন্থা এই দুই ধারাকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠা ধারাবাহিক সংগ্রামের ইতিহাস। এই সঠিক উচ্চারণ থেকে বিরত থেকে শুধু একটিমাত্র দিককে তুলে ধরাটা কোনো কাজের কাজ নয়। এতে ছাত্রলীগ হয়তো ছাত্রদলকে টেক্কা দেয়ার কাজে এগিয়ে যেতে পারবে, কিন্তু এর দ্বারা ছাত্রলীগকে গুণে-মানে উন্নত করা যাবে না।

ছাত্রলীগের জন্ম ১৯৪৮ সালে 'মুসলিম ছাত্রলীগ' হিসেবে। তৎকালীন মুসলিম লীগের নেতৃত্বে পরিচালিত 'নিখিল পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগকে' চ্যালেঞ্জ করে ছাত্রলীগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এসময় ভাষা আন্দোলন অগ্রসর হতে থাকে। বায়ান্নতে অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী প্রগতিবাদী চেতনার যে উত্থান ঘটে তার গর্ভে ১৯৫২-এর এপ্রিলে প্রতিষ্ঠিত হয় ছাত্র ইউনিয়ন। ছাত্র ইউনিয়নের ধারণ করা অগ্রসর চেতনা অতিদ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। এর প্রভাব এসে লাগে সর্বত্র। ছাত্রলীগও তার নাম থেকে 'মুসলিম' শব্দটি বাদ দিয়ে নিজেকে অসাম্প্রদায়িক বলে ঘোষণা করে। ছাত্র ইউনিয়ন যখন ছাত্রলীগের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল, তখন তার সাথে টেক্কা দেয়ার প্রয়োজনে ছাত্রলীগকেও ইতিবাচক ধারায় নিজেকে রূপান্তর করতে হয়েছে।

মনে রাখা দরকার যে, 'দলবাজী' ও 'আদর্শ ধারণ করা' কখনোই এক বিষয় নয়। বর্তমানে আদর্শগত শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও যাচাই কার্যক্রম ছাড়াই শিবিরের লোকদের ছাত্রলীগে যোগদানকে সমস্যা বলে বিবেচনা করার বদলে সেটিকে একটি অর্জন বলে গণ্য করাটা মারাত্মক বিপজ্জনক কাজ হচ্ছে। এভাবে চলতে থাকলে ছাত্রলীগ কি আবার তার 'মুসলিম ছাত্রলীগের' আদি অবস্থানে ফিরে যাবে না? এই আশঙ্কা অনেকের মনে ইতোমধ্যে জেগেছে।

যেকোন সংগঠনের সম্মেলনের থাকে ৩টি প্রধান কাজ। এক, অতীত কার্যকলাপের আত্মবিশ্লেষণমূলক ও বস্তুনিষ্ঠ পর্যালোচনা করা। দুই, অভিজ্ঞতার আলোকে ভবিষ্যতের জন্য কর্মপন্থা নির্ধারণ করা। তিন, নতুন নেতৃত্ব নির্বাচন করা। লক্ষণীয় হলো, ছাত্রলীগের সম্মেলনে প্রথম দুটি বিষয় মোটেও কোনো গুরুত্ব পায়নি। সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশনে নেত্রীর উপস্থিতি ও ভাষণের পর ছাত্রলীগের নেতৃত্ব কাদের হাতে আসবে সে বিষয়টিই মনোযোগের একক বিষয়ে পরিণত হয়েছিল। এই প্রবণতা যে বিরাজনীতিকীকরণের প্রক্রিয়াকে মদদ দেয় এবং তা যে সংগঠনে নীতি-আদর্শের ভিত্তিকে দুর্বল করে তোলে, তা বলাইবাহুল্য।

এটি অবশ্য প্রশংসার বিষয় যে এবার ছাত্রলীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক ডেলিগেটদের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হয়েছে। নির্বাচনে স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স ব্যবহার করা হয়েছিল-এই সাফল্য নিয়ে বেশ প্রোপাগান্ডাও করা হয়েছে। অবশ্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় দৈনিকে 'স্বচ্ছ বাক্সে অস্বচ্ছ ভোট' কিম্বা 'নীলনকশায় ৮ ধরনের ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং' শিরোনাম দিয়ে খবর প্রকাশ করেছে। এতদসত্ত্বেও বিনা ঝঞ্ঝাটে ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ছাত্রলীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হওয়াটা কম কৃতিত্বের কথা নয়।

কথা হলো, গণতান্ত্রিক পন্থায় সংগঠনের নেতৃত্ব নির্বাচনের ক্ষেত্রে ছাত্রলীগ যদি এই কৃতিত্ব দেখাতে পেরে থাকে তাহলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে ছাত্র সমাজের নেতৃত্ব নির্বাচনের জন্য সংসদসমূহের নির্বাচন অনুষ্ঠানে সমস্যা হওয়ার মোটেও কোনো কারণ নেই। সব শিক্ষা ...

গণতান্ত্রিক পন্থায় সংগঠনের নেতৃত্ব নির্বাচনের ক্ষেত্রে ছাত্রলীগ যদি এই কৃতিত্ব দেখাতে পেরে থাকে তাহলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে ছাত্র সমাজের নেতৃত্ব নির্বাচনের জন্য সংসদসমূহের নির্বাচন অনুষ্ঠানে সমস্যা হওয়ার মোটেও কোনো কারণ নেই

For Social Islami Bank Ltd.
(Md. Humayun Kabir, ACS)
Company Secretary
July 30, 2015